Yellow footed Green pigeon ছবি জয়দীপ সুচন্দ্রা কুণ্ডু

জঙ্গলের আড়াই কাহন

কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

(সুপারিনটেন্ডিং অ্যানথ্রপলজিস্ট, অ্যানথ্রপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া)

স্বর্গ কী?

মাইলের পর মাইল জঙ্গল যেখানে একজনও ফরেস্ট গার্ড নেই। সেটাই স্বর্গ।

নরক কী?

মাইলের পর মাইল জঙ্গল যেখানে একটাও মহুয়া গাছ নেই। সেটাই নরক।

নগর আর মহানগরের মানুষ কাজের চাপে হাঁফিয়ে উঠে দু-দণ্ড জিরিয়ে নিতে চান। তাঁরা সবুজের খোঁজে জঙ্গলে যান, লালমাটির মেঠো পথ দেখে শিহরিত হন। শাল, পলাশ, মহুয়া বিষয়ে কবিতা মনে পড়ে তাঁদের। রিসর্টের পাচক দেশি মুরগি রান্না করলে কেউ কেউ সেই ঝোলে জঙ্গলের ঘ্রাণ অনুভব করেন। কুর্চি ফুলের গন্ধে মুগ্ধ হয়ে জানতে চান নার্সারিতে ওই গাছের চারা পাওয়া যায় কিনা।

এই শিহরণ বা রোমাঞ্চ কোন দেশ বা সংস্কৃতিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায়শই নাগরিক জীবন যাপনে ক্লান্ত মানুষ জঙ্গলের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন সাময়িক বিরতির জন্য— জঙ্গল (বা পাহাড় অথবা সমুদ্র) তাঁদের কাছে ইউক-এণ্ড বিনোদনের উপকরণ। এই নাগরিকরা শিশু বয়স থেকে সেটাই জেনেছেন অরণ্যদেব আর টারজান সাহিত্যের

হাত ধরে। দুর্ভেদ্য-দুর্গম জঙ্গল হিংস্র পশু এবং হিংস্রতর মানুষের বাস— সেই আরণ্যক শৃঙ্খলাহীনতায় কিছু পরিমাণ শৃঙ্খলা আনে শ্বেতকায় নায়করা। পরবর্তীকালে এশিয়ার জঙ্গলে র‍্যাম্বো গোত্রীয় বীর যোদ্ধারা 'বর্বরতা' ও 'অসভ্যতা'র বিরুদ্ধে লড়াই করেছে 'সভ্যতা'র পক্ষ নিয়ে। ধন্য পালু সাহিত্য। ধন্য হলিউড, ধন্য ধন্য সুসভ্যতার বারুদ গন্ধ আসে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমপ্রান্তে একটি গ্রাম বাসরাস্তা পাঁচ কিলোমিটার হাঁটা পথের দূরত্বে, ডাকঘর ছ'কিলোমিটার আর প্রাথমিক বিদ্যালয় দু কিলোমিটার দূরে। গ্রামের চারদিকে জঙ্গল, বিদ্যালয়ে পৌঁছতে ওই গ্রামের শিশুদের অনেকটা পথ হাঁটতে হয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, সেচ নেই, জমি এক ফসলি, কিছু রোজগার আসে বাবুই ঘাসের দড়ি, শালপাতা আর বিড়িপাতা বেচে।

তাই বলে ওই গ্রাম বিস্মৃত নয়, অঞ্চলের সরকারি বাবুরা ওই গ্রামকে ভালো রকম চেনেন। দলমা পাহাড় থেকে হাতির দল বাঁকুড়া পুরুলিয়ার গ্রামে নেমে এলে তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় ওই গ্রামের কথা— হাতি খেদানোর জন্য ওই গ্রামের মানুষদের ডাক পড়ে বছরে বেশ কয়েকবার, দু-চারজন মাথা খারাপ টাইপ ছাড়া শহুরে বাবু০বিবিরা কেউ ওই গ্রামে যান না ধুলো পথে হেঁটে। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে একদল বাবু-বিবি ওই গ্রামে পৌঁছে গেছিলেন জিপগাড়ি চড়ে। তাঁদের কাছে খবর ছিল ওই গ্রামের লোক ভাতের অভাবে পিঁপড়ে ডিম খাচ্ছিলেন। ওই পরিদর্শকরা এত উত্তেজিত ছিলেন আর এত কথা বলছিলেন অনর্গল— গ্রামের কোন মানুষ সাহস করে তাঁদের বলতে পারেন নি যে পিঁপড়ের ডিম বেজায় টক হলেও লঙ্কা দিয়ে ঝাল ঝাল চাটনি বানালে ফ্যান ভাতের সঙ্গে খেতে দিব্যি লাগে। বলতে পারেন নি যে পিঁপড়ের ডিম কেউ ভাতের বদলে খায় না, ভাতের সঙ্গে খায়।

শহরে গ্রামে গঞ্জে বহু মানুষ আছেন যাঁরা প্রত্যন্ত জঙ্গলঘেরা গ্রামের বাসিন্দাদের কষ্টে পীড়িত বোধ করেন। জঙ্গল-প্রধান অঞ্চলে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা স্থায়ী ভাবে কোন গ্রামে থাকেন না, শিকার বা পশুপালনের মত জীবিকার কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান। গ্রাম ও শহরের অনেক বাসিন্দাই তাদের ভালো করতে চান।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জারোয়া জনজাতির মানুষরা বছর কুড়ি আগেও গ্রাম-শহরের মানুষদের এড়িয়ে চলতেন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে। যখন জারোয়ারা অন্য মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন, এই অন্য মানুষরা অনেকেই বলতে লাগলেন, এইবার জারোয়াদের সভ্য করার একটা সুযোগ এসেছে তাদের আর জঙ্গলে থাকতে দেওয়া বা জঙ্গলী জীবনযাপন করতে দেওয়া উচিত নয়।

একজন ভূমিহীন গ্রামবাসী যিনি অন্যের জমিতে খেতমজুরের কাজ করতেন—

তাঁর এবং তাঁর দুই ছেলের কোন স্থায়ী উপার্জন ছিলনা— তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, জারোয়াদের দায়িত্ব আমাদের দিয়ে দিক সরকার— ওদের আমরা কিছুদিনের মধ্যে ইনসান বানিয়ে দেবো। ওই ব্যক্তি নিজেকে সভ্যতার প্রতিনিধি মনে করেন এবং অন্যান্যদের প্রতিনিধিদের মতই মনে করেন সভ্য মানুষের দায়িত্ব অসভ্য মানুষকে সভ্য করে তোলা। এই দায়িত্ব বোধটি বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। যারা আমাদের মত নয় তাদের নিজস্বতা ভুলিয়ে আমাদের মত করে গড়ে নিতে হবে। এতে তাদেরই মঙ্গল, একদল জাতীয় স্তরের বিশেষজ্ঞ অনেক অনুসন্ধান করে যাযাবার জঙ্গলিদের উন্নতির জন্য কিছু নিদান দিয়েছিলেন, তার একটা ছিল, ওইসব জনগোষ্ঠীর শিশুদের আবাসকি বিদ্যালয়ে রাখতে হবে যাতে তারা তাদের বাবা-মার থেকে খারাপ জিনিস না শিখতে পারে।

সভ্য আর অসভ্যর এই দ্বন্দ্ব কিন্তু প্রাচীন নয়। এই বিরোধের মতাদর্শ তৈরী করা হয় গত পাঁচ শতক আগে থেকে ইওরোপীয় উপনিবেশ বিস্তার করার যুক্তি হিসেবে। সভ্যতার নানা প্রমাণ হাজির করা হতে লাগল ছাপা হতে থাকল— তাতে হাজির করা হল অসভ্য-বর্বর-নরখাদকদের দেশে সভ্য ইউরোপীয়দের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। সেইসব অসভ্য জঙ্গলিরা শুধু স্বভাবে হিংস্র নয় তাদের চেহারাও অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার। মার্কোপোলোর বর্ণনা অনুযায়ী আন্দামান দ্বীপের মানুষদের মুখ কুকুরের মত। তারা বিদেশী মানুষ দেখলেই আগুনে ঝলসে কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলে। ওইসব কাহিনী পাশ্চাত্যে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে তার সতাসত্য বিচার করার চেষ্টা হয়নি বললেই চলে। ওইসব ধ্যানধারণা ইউরোপীয় মননে এত প্রবল ছিল যে অসভ্যদের দেশ দখল করার জন্য, তাদের গৃহপালিত পশুর মত কেনাবেচা করার জন্য পাশ্চাত্যের মানুষের মনে বিশেষ বিকার হয়েছে বলে মনে হয় না।

এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, পাশ্চাত্য নির্মাণ অনুযায়ী অসভ্য মানুষদের বাসস্থান জঙ্গল। তাদের পরিচিতির সঙ্গে জঙ্গল ওতপ্রোত হয়ে গেল। এইখানে আরো এক ধরনের ঔপনিবেশিক যুক্তি সক্রিয় থাকল-নগররায়ণ মানে সভ্যতা আর যন্ত্রশিল্প মানে উন্নতি— এবং তার দাম মেটাতে জঙ্গলকে পিছু হটতে হবে। ঔপনিবেশিক কালের ভাষায় 'বন্য' শব্দের প্রয়োগ অসভ্য অর্থে, বন এবং বন্যতা সভ্যতার পরিপন্থী- রাজস্ব উপার্জন ছাড়া অন্য কারণে জঙ্গলের প্রয়োজন নেই। বনবাসী মানুষকে বন্য অবস্থায় থাকতে দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত।

প্রাচীন ভারতে অবস্থাটা ছিল গুণগতভাবে আলাদা। সামাজিক ভেদাভেদ ভারতীয় সমাজের অঙ্গ— চারটে বর্ণ এবং অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত সমাজে আর যাই থাক সাম্য ছিল না, ব্রাহ্মণ হত্যা মহাপাপ অথচ শূদ্র হত্যার অপরাধ পশু হত্যার থেকে বেশি নয়। এই সমূহিক অসমানতা এবং অমানিবকতা সত্ত্বেও সমাজের সবথেকে

ক্ষমতাশালীরা সমাজের সর্বনিম্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য বলতেন না— তোমরা আমাদের মত হও, এই বোধ কোথাও উপস্থিত ছিল যে সমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নতা স্বাভাবিক।

ভারতে বেশ কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা স্থির করে উঠতে পারেন নি রামায়ণ কাব্য না ইতিহাস। আদতে রামায়ণ একটি লোককাহিনী, সারা ভারত এবং ভারতীয় উপমহাদেশে এই কাহিনীর ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন রূপ, কিন্তু সবকটি ভাষ্যে একটি যুদ্ধের বর্ণনা আছে— যুযুধান দুই পক্ষের প্রথম সংঘাত হয়েছিল নগর থেকে দূরে কোন জঙ্গলে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ হসমুখ ধীরজলাল সাঙ্কালিয়া বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন রামায়ণের লঙ্কা আর বর্তমান কালের শ্রীলঙ্কা এক নয়, ওই রণক্ষেত্র ছিল মধ্যভারতের কোন অংশে। ওই অঞ্চলের গোঁড়া অধিবাসীরা বড় গ্রামকে বলেন লঙ্কা আর নদীকে বলেন সাগর, বাল্মীকিকৃত রামায়ণের ভাষ্য অনুযায়ী ওই যুদ্ধে বানরসেনা শালগাছকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন— দাক্ষিণাত্যে ওই গাছ বিরল কিন্তু মধ্যভারতে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্র যাত্রার বর্ণনায় লিখেছিলেন— দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য ফিভস্য সব বাজে কথা। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন আদি কবি আদৌ কোনদিন সমুদ্র দেখেছিলেন কিনা, সাঙ্কালিয়ার যুক্তি মানলে বলতে হয়, যথাযথ সমুদ্র বর্ণনার কোন প্রয়োজনই ছিল না রামায়ণের কাহিনীতে।

সাঙ্কালিয়া মনে করেন রামায়ণ বস্তুত রাজায়-রাজায় যুদ্ধের কাহিনী নয়। এই কাহিনীতে একটি অন্তর্লীন ভাষ্য আছে— গঙ্গা অববাহিকার কৃষিজীবি মানুষ আরও জমির সন্ধানে অরণ্যভূমির দখল চাইছে এবং অরণ্যবাসী মানুষ তাদের সম্পদ রক্ষার তাগিদে লড়াই করছে।

রামায়ণের বহু ভাষ্যের মধ্যে আমরা দুটো প্রধান ধারা দেখতে পাই। একটি ব্রাহ্মণবাদী ধারা— যেখানে শূদ্র শম্বুকের প্রাণদণ্ড হয় শাস্ত্রচর্চা করার অপরাধে, সেখানে শূদ্র নারী ও পশুদের লাঠিপেটা করার উপদেশে দেওয়া হয়। অপরদিকে আছে সেই লোকায়ত ধারা যেখানে লক্ষ্মণ ও সীতার মধ্যে হাসিঠাট্টার সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসী মানুষ (এবং পশুদের শুধুমাত্র প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়— বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অযোধ্যার রাজারা কিস্কিন্ধ্যাকে সভ্যতর করার দায়িত্ব কাঁধে নেন না, তাদের স্বকীয়তায় বাধা দেন না। বরং 'নিম্নতররা' যদি উচ্চবর্গীয়দের' আচার-ব্যবহার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ করতেন, সেটা মোটে বরদাস্ত করা হত না।

পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে বিজিতদের সম্পর্কের কিছু নমুনা দেখা যাক। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে কৃষিযোগ্য বা চারণযোগ্য জমি পশ্চিমী ঔপনিবেশিকরা নিজেদের

মধ্যে ভাগ করে নেয়। ওই মহাদেশের আদি অধিবাসীদের উপস্থিতি তাদের পছন্দ হয়নি— তাই সেই মানুষদের 'সভ্য' করার লম্বা রাস্তায় না গিয়ে পশ্চিমীরা অনেকই সহজতর রাস্তা বেছে নেয়। আদি অধিবাসীদের ডেকে এনে খেতে দেওয়া হয় কড়া বিষ মেশানো রুটি, তাদের পানীয় জলের উৎসে ঢেলে দেওয়া হয় বিষ। পবরবর্তীকালে আদি অধিবাসী পরিবারের শিশুদের বাবা-মার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্বেকতায় পরিবারে রেখে দেওয়া হয় যাতে তারা 'সভ্য' হওয়ার পাঠ নিতে পারে। সাদাদের কাছে ওই 'আত্মীকরণ' নামক প্রকল্প বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে, এত সস্তায় গৃহভৃত্য জোগাড় করা রাষ্ট্রের মদত ছাড়া সম্ভব ছিল না। অপরদিকে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। শিশু-কিশোর এবং যুব প্রজন্ম হারিয়ে যায় তাদের সমাজ থেকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসীদের অভিজ্ঞতা খুব আলাদা রকমের ছিল না।

উপনিবেশগুলোতে নির্বিচার গণ-উৎপীড়ন এবং গণ-সংহার সম্ভব হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্বগোষ্ঠী-কেন্দ্রিকতা এবং প্রবল আত্মম্ভরিতা। ইডেন নামক স্থানে ঈশ্বর সে মানব-মানবীকে সৃষ্টি করেন তারা সাদা মানুষ— আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ার কালো মানুষরা তাদের সন্তান নয়। এই ছিল একটা মত। আরো একটি মত ছিল— কালোরা ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষের বংশধর হলেও পরবর্তীকালে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে হীন হয়ে পড়ে, তারা আর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সমকক্ষ থাকে না।

ভারতের মোট ভূ-ভাগের ১৯ শতাংশ বৃক্ষ আচ্ছাদিত। তার অর্থ এই নয় যে এই সবটুকু জমি ঘন জঙ্গলে ঢাকা আসলে ভারতীয় অরণ্যের অনেক অংশ স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। উর্দিধারী এবং উর্দিবিহীন বহু মানুষ জঙ্গল থেকে রুটি রুজি উপার্জন করে বে-আইনী এবং অনৈতিক উপায়ে। তা হলে জঙ্গলকে সুস্থ রাখার উপায় কি?

উপগ্রহ থেকে তোলা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ছবিতে দেখা যায় সেখানে অধিকাংশ জঙ্গলই যথাযথ চেহারায় নেই— একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। গ্রেট আন্দামান দ্বীপের পশ্চিম উপকূল বরাবর একফালি জঙ্গল স্বাস্থ্য-ঝলমল— সেই অংশটুকুতে জারোয়া জনগোষ্ঠীর বসবাস। ওই দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন সরকারি বন-দফতর। তাই কারা অরণ্যভূমির দেখাশোনা ভালভাবে করতে পারেন তা বোঝাতে ওই একটি ছবি যথেষ্ট- হাজারো কথার দরকার নেই।

সাম্প্রতিক একটি খবরে নজর দেওয়া যাক। যেমন বাঘ অধ্যুষিত জঙ্গলে আদিবাসীরা বাস করেন, সেখানে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে। আর অন্যত্র? অন্যত্র কী ঘটছে, কাদের সহায়তায় জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি, জমি দখল আর চোরাশিকার চলছে,

তা অনুমান করার জন্য কোন পুরস্কার নেই।

ভারতে জঙ্গল, চারণভূমি এবং অন্যান্য ধরনের জমি ও জলাশয়, যা ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিলনা, তা ছিল সর্বসাধারণের। ব্যবস্থাটা পালটে গেল ইংরেজ শাসনের কালে উনিশ শতরে দ্বিতীয়ভাগে ঔপনিবেশিক সরকার সমস্ত পতিত জমির অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিল। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাদের মতে জঙ্গল এক প্রকার পতিত জমি। সরকার জঙ্গলভুক্ত জমিকে দুভাবে কাজে লাগাল। প্রথমতঃ জঙ্গল থেকে কাঠ এবং অন্যান্য ধরনের বিক্রয়যোগ্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে এবং ওইসব জমি থেকে বন-ছেদন করে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ জোগাড় করতে। দ্বিতীয়তঃ কিছু জঙ্গল রেখে দেওয়া হল বিনোদনের জন্য— সাহেব সুবো এবং রাজা মহারাজারা সেখানে শিকার খেলবেন। প্রশাসনিক ভাবে জঙ্গলকে দুভাগে ভাগ করা হল— সংরক্ষিত আর আরক্ষিত। প্রথম ধরনের জঙ্গলে স্থানীয় মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সীমিত অধিকার থাকল বনজ সম্পদ ব্যবহার করার— সেটাও সম্পূর্ণভাবে সরকার বাহাদুরের অনুমতি সাপেক্ষে।

ওই সময় থেকেই রেললাইন বসাতে ও রাস্তা বানাতে, নতুন গ্রাম ও শহর পত্তন করতে বা পুরনো গ্রাম-শহরের বিস্তার ঘটাতে, আরও কৃষিজমি বাড়াতে জঙ্গল নিকেশ করা শুরু হল দ্রুতহারে। এরফলে বহু মানুষ তাঁদের জীবিকার সম্বলটুকু হারিয়ে ফেললেন। নতুন জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দিলেন অন্যত্র। প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তরাধিকার হারানো ওই উদ্বাস্তুরা অনেকেই চা বাগানের একটি কুলি বা কারখানার মজুর হয়ে গেলেন। ফলে জঙ্গল উচ্ছেদ হয়ে দাঁড়াল একটি দ্বিগুণ লাভের প্রকল্প-প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার ব্যবস্থাও হল আবার সস্তায় কুলি জোগানের রাস্তাও খুলে গেল।

স্বাধীনতার পরে অবস্থা কতটা পালটেছে? সম্পদের অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রসঙ্গ আপাতত তোলা থাক, নতুন করে ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার পালা কি শেষ হয়েছে? প্রশ্নগুলো সহজ এবং উত্তরটাও জানা। এই মুহূর্তে পরিবেশ অবক্ষয়ের দৌড়ে (মূলত জঙ্গল ও জলাভূমির বিনাশ) ভারত বিশ্বসেরা দেশগুলোর মধ্যে আছে। আমাদের কাছের বন্ধুরা হল চিন, মেক্সিকো, সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মধ্য আমেরিকার দেশগুলো।

ইংরেজ শাসনকালে ভারতীয় মগজ যথেষ্ট পরিমাণে ধোলাই হয় তার ফলে দেশী বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইরা ভাবতে শুরু করেন তাঁরা জঙ্গলবাসী মানুষদের থেকে শুধু জাতিগত ভাবে আলাদা নয়, সম্ভবত প্রজাতিগত ভাবেও ভিন্ন। কারণ সেটাই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্যতার পরবর্তী ধাপ, অন্যদের নিজের মত বানানো চেষ্টা করা। বিভিন্নতাকে অস্বীকার করা, রামায়ণ একালে রচনা করা হলে সম্ভবত একটা গোটা অধ্যায় লেখা

হত কিস্কিন্ধ্যাকে অযোধ্যা বানানোর পদ্ধতি ও প্রকরণ বিষয়ে। এমনিতেই কারা আদিবাসী আর কারা বনবাসী- এই বিষয়গুলোকে যথেষ্ট ঘুলিয়ে রেখেছে রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থে, কিন্তু একটা বিষয়ে তারা একমত- বন্যদের এমন কল্যাণ করতে হবে যাতে তারা আর তাদের বাপ-ঠাকুরদার ভাষায় কথা না বলে, তাদের ঠাকুর দেবতাকে পুজো না করে তারা যে ছাইপাশ খেত, সেসব না খেয়ে, তারা তিলক-টিকি-দাড়ি শোভিত পুরো সভ্য না হলেও আধাসভ্য হয়ে যেন সভ্যদের সেবা করে।

বনবাসী যারা-সেই বিষয়ে একটা ধন্দ তৈরী করা হয়েছে এবং সযত্নে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়ে ভারতের জনসংখ্যা ১২৯ কোটি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতীয়দের ১৯.৩ শতাংশ বা ২৫ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বন ও বনজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে ১০ কোটি মানুষ অনুসূচিত জনজাতি, যারা বর্ণ-ব্যবস্থার ধার ধারেনা। বাকি ১৫ কোটির মধ্যে অনুসুচিত জাতি এবং অ-অনুসুচিত গোষ্ঠীর মানুষরাও আছেন। অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন এখনও জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল। বাঘ বাঁচানোর কথা যতবার বলা হয়, ওই উনিশ শতাংশ দেশবাসী ততটা মনোযোগ পায়?

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের পরে ভারতে প্রকট খাদ্য সংকট হয়নি বটে কিন্তু তার আগে, বিশেষ করে ইংরেজ শাসনের কালে দুর্ভিক্ষ ঘটেছে ঘনঘন। মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর মৃত্যু ঘটেছে ব্যাপক হারে। ওইসব দুর্ভিক্ষ কতটা প্রাকৃতিক কারণে ঘটেছে এবং কোনটা বা মানুষের তৈরি, সেই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিন্তু সর্বত্র একরকম ছিল না। একটা অঞ্চলে জঙ্গল আছে কি নেই তার সঙ্গে দুর্ভিক্ষের প্রকোপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যেসব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষছেদন হয়েছিল, সেই সব অঞ্চলের মানুষদের কাছে বিকল্প খাবার সহজলভ্য ছিলনা। অন্যদিকে বনাঞ্চলের মানুষদের কাছে জঙ্গল ছিল বিকল্প খাবারের নির্ভরযোগ্য উৎস। ফলে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রভাব তাঁরা কিছু পরিমাণে ঠেকাতে পারতেন। কয়েক বছর আগে পূর্ব ভারতের কোন এক বনাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, এখনও ওই দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা তাঁদের স্মৃতিতে আছে। এই প্রজন্মের মানুষ প্রবীণদের থেকে জেনেছেন জঙ্গলের কোন গাছের পাতা, কন্দ বা মূল একসময়ের খাদ্য, এ.পি.এল আর বি.পি.এল-এর যুগেও সেই শিক্ষা তাঁদের স্মরণে আছে।

এখনও সভ্য হওয়া কিছু বাকি আছে। এখনও কয়লা আর লৌহ আকরিক হাতছানি দিয়ে ডাকে জঙ্গল-প্রদেশ থেকে। এখনও পঁচিশ কোটি লোক ভিটেছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় রাত জাগে। এখনও উন্নতির ঘোড়া সব জনপদ জয় করেনি। এখনও কত অসভ্য মানুষের কল্যাণ করা বাকি আছে।

কার কল্যাণ কে করে সেটাই বিষম চিন্তার বিষয়। শহরের আনাচে কানাচে গড়িয়ে পড়ছে দারিদ্র্য, গ্রামে কৃষক পরিবারে আত্মহত্যা ক্রমশ সংবাদপত্রের পেছনের পাতায় সরে যাচ্ছে, নাগরিক বাবু-বিবিরা তখন জঙ্গলবাসীদের ভাল করতে ছুটে বেড়ান। মন্দ লোক নিন্দে করে নানা কথা বলে। তারা বলে, যার সম্পর্কে ভাল করে জানা নেই এবং জানার আগ্রহটুকুও নেই, যাকে শিশুবৎ এবং অনাথবৎ মনে করে কেবলই জ্ঞান আর করুণা বিতরনের চেষ্টা, তার ভাল করেই ছাড়বেন বাবু-বিবিরা তারা সে ভাল চাক আর নাই চাক। যদি সম্পর্কটা একটু উলটে নেওয়া যায়, যদি চেনা বিষয়গুলো দূরবিনের অন্যদিক দিয়ে দেখা যায়, কেমন লাগবে দেখতে?

দেশে এবং বিদেশে কিছু মানুষ ভারি চিন্তাত জারোয়াদের উন্নতির উপায় ভেবে। আধুনিক ভারতের কিছু নাগরিক জঙ্গলে বাস করবে, তাদের সরকারি টাকায় পাকা বাড়ি করে দেওয়া হবে না, তাদের বি.পি.এল তালিকাভুক্ত করে সস্তায় চাল আর তেল দেওয়া হবে না— তাহলে দুনিয়া বুঝবে কি করে আমরা বনবাসীদে উন্নতি চাই?

এই ভাল করতে চাওয়া মানুষদের একটা অংশকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে জারোয়ারা গ্রাম বা শহরের অর্থে গরীব নয়, চারশর কিছু বেশি মানুষ সাড়ে সাতশ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জঙ্গল ভোগদখল করছে— ও জঙ্গলে তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার ও অন্যান্য জিনিস দরকারের থেকে অনেক বেশি আছে। তাই জারোয়াদের মঙ্গল করার নামে ভিটেচ্যুত করে কৃষিমজুর না বানানালেও চলবে। কিন্তু মুশকিল হল, এইসব যুক্তিতে ভাল করতে চাওয়া বাবু-বিবিরা খুব কান দেন না।

একবার একটা অন্যরকম চেষ্টা করে দেখা হয়েছিল। দু-চার জন মধ্যবয়সী জারোয়া ব্যক্তিকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। গ্রাম ও শহরে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা খুব গরীব, তাঁরা পেটভরে খেতে পান না, অনেকের একটা বাসস্থান পর্যন্ত নেই। এই গরীব মানুষের কয়েকজনকে যদি জঙ্গলে জারোয়াদের সঙ্গে থাকতে বলা হয়, তা হলে কেমন হয়?

জারোয়া ব্যক্তিরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। বললেন, প্রথমে কিছুদিন তারা জারোয়াদের সঙ্গে থাকতে পারেন, আহার এবং, বাসস্থানের ব্যবস্থা আমরাই করে দেবো। কিন্তু ওই আশ্রিত ব্যক্তিদের কাজ শিখতে হবে। পুরুষরা শিকার করবে, মাছ ধরবে, মহিলারা ঝুড়ি বুনবে, ফল-মূল সংগ্রহ করবে। এইসব কাজ শিখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব জারোয়াদের— শিশু কিশোরদের খেলার ছলে এইসব কাজ শেখান হয়— বাইরের মানুষেরা সেভাবেই শিখবেন। কিন্তু তারপর ওই নতুন মানুষদের নিজেদের কাজ নিজেদের করে নিতে হবে— এখানে সবাইকে কাজ করে খেতে হয়।

বাবু—বিবিরা শুনছেন?